‘আউট অফ কনটেক্সট্’

মীজান রহমান

অংক আর ধর্ম – দুয়ের প্রকৃতি একেবারে বিপরীত। অংকের মধ্যে বিশ্বাস বলতে কিছু নেই, সবই প্রমাণ। ধর্মের মধ্যে প্রমাণ বলতে কিছু নেই, সবই বিশ্বাস। এক অংকমনস্ক ধার্মিক লোক অংকের ক্ষেত্রতাত্বিক ধাঁচে ফেলে আল্লার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি যে ঐ চেষ্টাটাও তাঁর বিশ্বাসেরই ফল, প্রমাণের নয়। বিশ্বাস হল একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস, প্রমাণ একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক অংককে নিখুঁত বিজ্ঞান বলা হয় এই কারণেই – এখানে আন্দাজ অনুমান বা মতামতের স্থান নেই। ওদিকে ধর্মকেও দাবি করা হচ্ছে নিখুঁত বলে। সংসারে একটি ধর্মও দেখিনি যা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা নিখুঁত বলে দাবি করেনি। আধুনিক যুগের লোকশুদ্ধির (political correctness) কারণে অবশ্য বলা হয় ‘যার যার ধর্ম তার তার কাছে’, তবে ভদ্রতার মুখোশটা খুলে ফেললে দেখা যাবে অন্য রূপ ঃ ‘হ্যাঁ তোমার ধর্ম ধর্ম বটে, তবে আমারটাই শ্রেষ্ঠ’। প্রমাণ নেই বলেই এটা হয়। প্রমাণহীন বিশ্বাস মানুষকে শিখতে হয় যখন প্রমাণ খোঁজার বয়স হয়নি তখন থেকে। নইলে মানুষের জিজ্ঞাসু মন প্রশ্ন করবেই। শৈশবে ধর্ম একটা গল্পের মত, তাই তার এত আকর্ষণ। আমার দাদীনানীরা আমাকে গোর-আজাবের গল্প শোনাতেন, হাশরের গল্প বলতেন – আমি ভয়ে কাঁপতাম, তাঁদের কাছ ঘিরে বসতাম, আবার ভালও লাগত শুনতে, যেমন করে ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগে বাচ্চাদের। কিন্তু অংক বড় কাটখোট্টা জিনিস ওদের জন্যে – অংকের মধ্যে ভূতের গল্প নেই, রাজরানীর গল্প নেই, হুরপরীর গল্পও নেই। অংক আসে চিন্তাশক্তি থেকে। কিন্তু চিন্তাশক্তিটা ফুটে উঠবার আগেই বাবামা, আত্মীয়স্বজন আর ওস্তাদজীর নানা বাস্তব-অবাস্তব গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তিটা তৈরি হয়ে যায়। তারপর যখন চিন্তা, যুক্তি, বিশ্লেষণক্ষমতা – এগুলো আস্তে আস্তে আকার নিতে শুরু করে তখন সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কখনো খানিক নড়ে ওঠে, কখনো আবার দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বিশ্বাসের ঘোর ক্রমে কাটতে শুরু করে বা পূর্ণ অন্ধত্বের পথে পদার্পণ করে। আমার অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব নেমেছে দ্বিতীয় পথটিতে, কেবল আমিই পারছি না ছোটবেলার বিশ্বাসগুলোকে শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতে। পবিত্র কোরাণ অনুযায়ী আমার কপালে অনেক দুর্গতি আছে।

জানি, অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী পরম ধার্মিকও ছিলেন। আলবার্ট আইনস্টাইন বাহ্যত না হলেও মনেপ্রাণে খুব ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই অনেকের ধারণা। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘ঈশ্বর কখনো ছক্কার বাজি খেলে না’ বিজ্ঞানমহলে কারো অবিদিত নয়। এই একটি যুক্তি দিয়েই তিনি গোটা কোয়াণ্টামতত্বটাকেই নাকচ করে দিতে চেয়েছিলেন। নোবেলবিজয়ী পদার্থবিদ আব্দুস সালামও শেষ জীবনে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে ধর্মবাদীরা উৎসাহিত হয়ে হয়ত বলতে চাইবেন ঃ ‘তাহলে দেখলেন তো ?’ আমি বলব, তাঁরা বিশ্বাস করতেন বলেই যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের ওপর বিশ্বাসভিত্তিক যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে না। তাতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে বড় বড় মনীষীরাও ছোট ছোট মানুষ, তাঁরাও জীবজগতের মানুষ নামক স্তন্যপায়ী দ্বিপদী সদস্যের নানাবিধ জৈবিক উপকরণ দিয়ে তৈরি, তাঁদেরও শৈশব বাল্য আর কৈশোর আছে, এবং তাঁরাও বাবামা. ওস্তাদজী আর পরিপার্শ্বের পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত বটে। আবার এমনও অনেক বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা ঈশ্বরকে মানা দূরের কথা, তাঁর অস্তিত্বের ওপরই কোন আস্থা নেই তাঁদের। তার অর্থও এই নয় যে তাঁরা যা বলছেন সেটাই ঠিক – সত্যি সত্যি কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। একটা জিনিস আছে কি নেই তার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকের ওপর করে না, নির্ভর করে বিজ্ঞানের ওপর। তাই বলি যার অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করার উপায় নেই মানুষের তাকে বিশ্বাস করাটা যেমন শুধুমাত্র বিশ্বাসেরই ব্যাপার, বিশ্বাস না করাটাও আরেকরকমের বিশ্বাস। শূন্য আছে আর শূন্য নেই – দুটো উক্তির মধ্যে গুণগত তফাৎ আমি দেখি না। আমি জানি না কারণ আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

এই জানা-নাজানার ব্যাপারটা কিন্তু স্বয়ং আইনস্টাইনই শিখিয়ে গেছেন আমাদের। তাঁর আপেক্ষিক তত্বের প্রথম সূত্রটি আবিষ্কারের আগে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশটুকু জুড়ে, পশ্চিমের পদার্থবিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন 'ইথার' নামক একটি অলীক বস্তুকে। তাঁদের যুক্তিতে শব্দতরঙ্গ যেমন বাতাস ছাড়া চলতে পারে না, আলো, যা শব্দের মতই (তড়িৎচৌম্বিক) তরঙ্গবিশেষ, তারও একটি মাধ্যম ছাড়া চলবার কথা নয় এবং সে-মাধ্যমকে হতে হবে পুরোপুরি স্থিতিশীল – সংসারের ধ্রুবতম স্থিতাবস্থা হবে সেই মাধ্যমটিরই। বহু মেধাবী বিজ্ঞানী বহু বছর ধরে গবেষণা চালালেন সেই স্থিতমাধ্যমকে আবিষ্কার করার চেষ্টায়। কিন্তু সেই রহস্যময় ইথার কারো চোখে ধরা দিতে চাইল না। শেষে মাইকেলসন আর মর্লি নামক দুই আমেরিকান বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে আইনস্টাইন পৌঁছুলেন তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ঃ ইথার নামক কোন বস্তু আছে কি নেই তা নির্ধারণ করার সাধ্য মানুষের নেই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের আপেক্ষিক গতিটাই শুধু নিরূপণ করা সম্ভব, কারো ধ্রুবস্থিতি আবিষ্কার করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং ইথারের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোটাই অর্থহীন। এটা পদ্ধতির দোষ নয়, যন্ত্রপাতিরও দোষ নয়, এটাই প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এই মৌলিক উপলব্ধি থেকেই ক্রমে ক্রমে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতত্ব, নানা শাখাপ্রশাখায়, কাল ও ব্যাপ্তির অপূর্ব সমন্বয় ও জ্যামিতিক রূপরেখায় বিকশিত হয়ে, বিস্ময়কর সব তথ্য নিয়ে এল একের পর এক। আপেক্ষিকতত্ব শুধু বিজ্ঞানজগতেই বিপ্লব সৃষ্টি করেনি, মানুষের চিন্তাজগতেও এনে দিয়েছে এক বহুমাত্রিক বিস্তার। মানুষকে শিখিয়েছে জীবন ও জগতকে নতুনভাবে চিন্তা করতে। একটু আগে ঈশ্বরকে নিয়ে যে ক'টি মন্তব্য আমি পেশ করলাম তার মূল ধারণাটি কিন্তু এসেছে এই তত্ব থেকেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, আইনস্টাইনের ইথারের মতই। বিশ্বাস করলেই তিনি আছেন, না করলে নেই।

ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে অবধারিতভাবে জড়িত আরেকটি প্রশ্ন ঃ এই বিশ্বাসের ভিত্তিটা কি। তাঁকে যখন দেখা, শোনা, বোঝা বা জানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে তখন তিনি আছেন কি নেই সেই প্রশ্নটাই বা জাগল কেমন করে আমাদের মনে। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেটা আপনাআপনি জাগেনি, কোন একটি ব্যক্তির মাধ্যমে জেগেছে। একজন সাধুপুরুষ, মহাপুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ – এমন কোন পুরুষ মানবজাতির কাছে নানা বাণী নিয়ে এসেছেন নানা যুগে। দাবি করেছেন যে সেই বাণী এসেছে ঈশ্বর নামক এক সর্বশক্তিমান সত্তার কাছ থেকে এবং তাঁরা কেবলি সেই মহাশক্তির পরম অনুগত আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। সুতরাং আপনার আমার মত সাধারণ মানুষের ঈশ্বরবিশ্বাস কিন্তু মূলত একটি বিশেষ পুরুষের ওপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। এই বিশেষ মানুষটিকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করি বলেই আমরা 'মহাপ্রভু' নামক এক অজানা শক্তিকে বিশ্বাস করি। মানুষটিকে ছাড়িয়ে প্রভুকে দেখার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই। এই অতিমানবটি বৌদ্ধদের কাছে এসেছেন বুদ্ধরূপে, শিখের কাছে নানকবেশে, ইহুদীর কাছে এসেছেন মুসার আকৃতি নিয়ে, খ্রীষ্টানের কাছে ইসা আর মুসলমানদের কাছে এসেছেন মুহম্মদ (দঃ) হয়ে। শেষোক্ত তিনটি ধর্মের মূল বাণী প্রায় অভিন্ন – ঈশ্বর (যাঁকে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ভাষায় নামকরণ করা হয়েছে) এক ও অদ্বিতীয়, তিনি নিরাকার, তিনি সর্বস্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজান্তা, তিনি নিত্য, আদিঅন্তহীন ও মহামহিম। এগুলোতে কারো দ্বিমত নেই। এমনকি যারা মূর্তিপূজা করে তাদেরও পূজার লক্ষ্যটা কিন্তু মাটির মূর্তি নয়, মূর্তির অন্তরালের সেই বিমূর্ত সত্তাটি। কিন্তু মূল থেকে একটু দূরে গেলেই মিলটা কেমন করে যেন একেবারে মিলিয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় বিতর্ক, বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সহিংসতা, যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ যদি সত্যি সত্যি একই বাণী নিয়ে এসে থাকেন একই ঈশ্বর থেকে তাহলে সেই বাণীতে কি পরস্পরবিরোধী ইঙ্গিত থাকা সম্ভব ? ঈশ্বর নামক এই সর্বজ্ঞানী মহাশক্তিটির অস্তিত্ব যদি মেনেই নিই তাহলে তিনি একেক যুগে একেক পুরুষের মাধ্যমে একেকরকম বাণী পাঠিয়ে মানবজাতিকে চরম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দেবেন এটা কি অভাবনীয় মনে হয় না ? এ-প্রসঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠতে পারে। বিধাতা তো শুধু পুরুষই সৃষ্টি করেননি, নারীও তো তাঁরই সৃষ্টি। নারীকে হয়ত পুরুষের বাহুবল দিয়ে সৃষ্টি করেননি তিনি, কিন্তু প্রাণশক্তি আর ধীশক্তিতে দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ রেখেছেন বলে আমার মনে হয় না। তাহলে এটা কি ভাববার বিষয় নয় যে বিশ্বমানবতার কাছে তাঁর বাণী বহন করবার জন্যে বারবার তিনি পুরুষকেই নির্বাচিত

করবেন, নারীর দিকে একবারও ফিরে তাকাবেন না ? নারীকে অবহেলা করার ইতিহাস পুরুষের আছে সেটা কারো অজানা নয়, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ যিনি তিনি যে একই অবহেলার গ্লানিতে কলঙ্কিত হবেন সেটা কি আদৌ সম্ভব ? আপনার কথা জানি না ভাই, কিন্তু আমি তা কল্পনাই করতে পারি না। ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন তাহলে পুরুষের কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করবে না সেটাই আমার বিশ্বাস। সুতরাং প্রশ্নের অবকাশ আছে, গভীর মৌলিক প্রশ্নের সমাধান ছাড়া স্রষ্টা আর সৃষ্টির সম্যক উপলব্ধি সম্ভব বলে মনে হয় না। দুঃখের বিষয় যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো সেই প্রশ্নের দুয়ারে খিড়কি লাগিয়ে বসেছে – খোলার উপায় নেই। তারা বলছে ঃ প্রথমে ঈমান বা বিশ্বাস, পরে প্রশ্ন। কিন্তু আমার আধুনিক গাণিতিক মন চায় ঃ প্রথমে প্রশ্ন, তারপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাস। যা যুক্তিসঙ্গত নয় তা গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে। পাপপুণ্য স্বর্গনরক এই শব্দগুলি মানুষেরই আবিষ্কার – এর সঙ্গে আমার সৃষ্টিকর্তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আমি জানি না, সেটা আমি অন্যের জ্ঞান দিয়েও জানতে চাই না, আমি চাই নিজেরই অর্জিত জ্ঞান দিয়ে জানতে। তাঁর কাছে আমার যাত্রা একান্ত আমারই একাকী যাত্রা – এই যাত্রায় কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই আমার। কিন্তু দরগার পাণ্ডাদের মত ধর্মের সশস্ত্র প্রহরীরা এসে পথে বেঁধে রাখে আমার। শাস্ত্রের ভয় দেখায়, ফতোয়ার ভয় দেখায়, – 'যেতে দেব না এই পথে, আমরা যে-পথ বাৎলে দিয়েছি তোমাকে সেই পথই তোমার একমাত্র পথ। তোমার পথ দোযখের পথ, একমাত্র আমাদের পথই যায় জান্নাতের দিকে।'

আমি যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি সে-ধর্মের প্রায় সকলের মুখে একই কথা ঃ পৃথিবীতে একটিমাত্র গ্রন্থ আছে যেখানে সব প্রশ্নেরই পরিষ্কার উত্তর লেখা আছে। সব তত্ত্বের তাত্ত্বিক, সব তথ্যের তথ্যবাহক, সব জ্ঞানের জ্ঞানকোষ, সব আবিষ্কারের আবিষ্কারক এই গ্রন্থটির নাম কোরাণ – পবিত্র কোরাণ। এই কোরাণ পড়তে আমাকেও শিখতে হয়েছে ছোটবেলায়। বাংলা-ইংরেজী শিখবার আগে আমাকে আরবি পড়া শিখতে হয়েছে শুধুমাত্র কোরাণ পড়ার জন্যে। মুখস্থ করতে পারিনি তবে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে কোরাণ খতম করতে পেরেছিলাম একাধিকবার। তাতে আমার পুণ্যের খাতায় হয়ত কিছু 'এয়ার মাইল্‌স্' জমা হয়েছিল, কিন্তু আমার বুদ্ধি চিন্তা ও মনমানসের কতখানি উপকার হয়েছিল বলা মুশকিল, কারণ শব্দের অর্থ না বুঝে হাজারবার পড়লেও জ্ঞান ঢোকে না মাথায়। প্রথমবয়সে আমি কোরাণ পড়েছি মুরুব্বিদের ভয়ে, নিজের আগ্রহে নয়। কোরাণের মানে বোঝার জন্যে তাঁরা কখনো চাপ দেননি, প্রধানত তাঁরা নিজেরাই বুঝতেন না বলে। ধর্মশাস্ত্রের ব্যাপারে আমাদের সমাজে জ্ঞানের চর্চা নেই, আছে শুধু অন্ধভাবে পালনের চর্চা। এই কারণে উচ্চশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ লোকেরাও অনায়াসে মেনে নেয় অল্পশিক্ষিত বা একেবারেই অশিক্ষিত মোল্লাদের নীতিনির্দেশ শাসন-অনুশাসন। দুঃখের বিষয় যে আমি তা পারিনি। নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেকেই খুঁজতে হয়েছে আমার। বড় হয়ে, অংকশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ দীক্ষালাভের পর, আমি চোখমন খোলা রেখে আকৃষ্ট হয়েছি স্বয়ং কোরাণেরই দিকে। সময় থাকলে আমি ভাষাটাকেই শিখে নিতাম নির্দ্বিধায়, শুধু কোরাণ বোঝার খাতিরে, কিন্তু আমার সময় নেই, বয়সও নেই চট্ করে একটা নতুন ভাষা শিখে ফেলার। তাই আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে ইংরেজী তরজমার। দুটি অনুবাদ গ্রন্থ আমার হাতে আছে যা অনেকেই বেশ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। একটি হল মৌলানা ইউসুফ আলী প্রণীত বিশাল গ্রন্থের ১৯৭৯-তে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ। একপাশে মূল আরবি, আরেকপাশে তাঁর প্রায়-আক্ষরিক তরজমা, এবং ছোট অক্ষরে দীর্ঘ পাদটীকাপূর্ণ গ্রন্থখানি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে। তবে তাঁর ইংরেজী ত্রুটিহীন হলেও শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে খানিক প্রাচীনপন্থী, ফলে একটু ভারাক্রান্ত মনে হয় মাঝে মাঝে। সে হিসেবে মৌলানা দাউদের ১৯৯৯-তে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, যার প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬ সালে বেরিয়েছিল পেঙ্গুইন প্রকাশনীর ধ্রুপদীধারাতে, ওটা আমার কাছে খুবই সুখপাঠ্য মনে হয়েছে। তাঁর ইংরেজী বেশ আধুনিক, ঝরঝরে, প্রাঞ্জল – অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ইউসুফ আলী সাহেব যাকে বলেন "... whom your right hand possesses", দাউদসাহেব তাকে অকপটে "slave-girls" বলে দিচ্ছেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দুটোকে পাশাপাশি রেখে এই অমূল্য গ্রন্থখানির মর্ম বুঝবার চেষ্টা করব। হয়ত অবশেষে আমার মনের দীর্ঘকালের জমা প্রশ্নগুলোর সমাধান মিলবে চূড়ান্তভাবে। ভাবলাম, শেষ জীবনে হয়ত খানিক শান্তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু কোথায় শান্তি ! বরং নতুন অশান্তি যোগ হচ্ছে মনে। পড়তে পড়তে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়ে নতুন প্রশ্নের দেয়াল তৈরি হচ্ছে। তারই কিছু উদাহরণ দিচ্ছি আজকে।

প্রশ্ন ঃ ধরে নেওয়া যাক যে আল্লা আছেন। কোরাণ যে তাঁরই প্রেরিত বাণী, অন্য কারো নয়, তার প্রমাণ কি ?

উত্তর ঃ একটা উত্তর আমি কোরাণেই খুঁজে পেয়েছি। "If it had not come from God, they could have surely found in it many contradictions." (4:82, Dawood). অর্থাৎ, এ-গ্রন্থ যদি স্বয়ং আল্লারই বাণী না হত তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই অনেক অসঙ্গতি খুঁজে পেত এতে।

এখন সন্ধানী মনে প্রশ্ন জাগবে ঃ অসঙ্গতি কি একেবারেই নেই ? খোঁজা যাক তাহলে। (5:51, Dawood)-এ লেখা আছে ঃ "Believers, take neither the Jews nor the Christians for your friends. They are friends with one another. Whoever of you seeks their friendship shall become one of their number. God does not guide the wrongdoers." ইউসুফ আলীর অনুবাদে এই পরিচ্ছেদটি ৫ঃ৫৪ বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং বর্ণিত হয়েছে খানিক ভিন্ন ভাষায়, কিন্তু দুটির মূল অর্থ একই, যা খুবই স্বাভাবিক। বাংলাতে আমাদের জ্ঞানীগুণী মৌলভীসাহেবরা কিভাবে ব্যক্ত করেছেন জানি না, তবে আমার বাংলাতে দাঁড়ায় ঃ "মুসলমানগণ, তোমরা ইহুদী আর খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাউকে বন্ধুহিসেবে গ্রহণ করবে না। তারা কেবল পরস্পরেরই বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে'ই ওদের বন্ধুত্ব কামনা করবে সে'ই ওদের একজন হয়ে উঠবে। আল্লা কখনো বিপথগামীকে পথপ্রদর্শন করে না।" পংক্তিটি পড়ার পর খানিক চমকে উঠলাম আমি। সত্যি বলতে কি, অতখানি বিদ্বেষ দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্তত আল্লার কাছ থেকে আমি আশা করিনি। বিশেষ করে যখন বারবার বলা হয়েছে এই কোরাণেরই মধ্যে যে আল্লা শুধু মুসলমানেরই স্রষ্টা নন, ইহুদী-খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরও। এ'ও বলা হয়েছে কোরাণে যে ইহুদী এবং খ্রীষ্টান দুই সম্প্রদায়ের জন্যই তিনি আলাদাভাবে পবিত্র গ্রন্থ পাঠিয়েছেন, পাঠিয়েছেন তাঁরই পছন্দের নবীদের। মাত্র ছয়শ' বছরের ভেতরে এই দুটি সম্প্রদায় কেমন করে তাদের সৃষ্টিকর্তার এতখানি বিরাগভাজন হয়ে উঠল সেটা কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমার হতভম্ব ভাবটা আরো ধাক্কা খেল দু'তিন পাতার পর। (৫ঃ৬৫, দাউদ)-এর শেষ পংক্তিতে লেখা আছে ঃ "Believers, Jews, Sabaens and Christians – whoever believes in God and the last Day and does what is right – shall have nothing to fear or to regret." অর্থাৎ "মুসলমান, ইহুদী, সেবিয়ান বা খ্রীষ্টান, যারই বিশ্বাস আছে আল্লার ওপর, বিশ্বাস আছে হাশরের দিনের ওপর, সুপথে জীবনপালন করে, তার কোন ভয়ের কারণ নেই। কারণ নেই কোন অনুশোচনারও।" কি সুন্দর প্রাণজুড়ানো বাণী। মনটা ভরে যায় শান্তিতে। সাথে সাথে একটা পীড়াদায়ক প্রশ্নও জেগে ওঠে মনে ঃ (৫ঃ৫১ দাউদ) আর (৫ঃ৬৫ দাউদ) এই দু'টি বাণী কি একই আল্লা থেকে নাজেল হয়েছে ? সেটা কি করে সম্ভব ? অন্তত আমার চোখে তো দু'টির ভিতরে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাই না। নাকি আমারই বোঝার ভুল ? এই আপাতসহজ কথাগুলোর গূঢ় অর্থ আছে কি কোন যা আমার বোধগম্য নয় ? তাই বা মানি কি করে।

প্রশ্ন ঃ কোরাণ নাজেল হয়েছে সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ওপর। এর মধ্যে হাজার হাজার আলেম ফারেজ পণ্ডিত হাজররকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোরাণের বিভিন্ন বাণীর। অনেক সময় এক ব্যাখ্যার সঙ্গে আরেক ব্যাখ্যার আকাশ পাতাল তফাৎ। সাধারণ মানুষ তাহলে কোন্ ব্যাখ্যাটি নেবে ?

উত্তর ঃ কোরাণ থেকে আমি যেটুকু বুঝলাম তাতে তো মনে হয় না যে অন্য কারো ব্যাখ্য ছাড়া কোরাণ বুঝতে কষ্ট হওয়া উচিত। (৪৩ঃ৩, ইউসুফ আলী)-তে পরিষ্কার লেখা আছে ঃ "We have made it a Quran in Arabic, that ye may be able to understand (and learn wisdom)." অর্থাৎ "আমরা আরবিভাষায় কোরাণ পাঠালাম যাতে কারো বুঝতে (এবং জ্ঞান আহরণ করতে) অসুবিধা না হয়।" কই এখানে তো কোন মোল্লা-আলেম বা প্রাইভেট মাস্টারের উল্লেখ নেই। এই আয়াতটি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে

হয়েছে। কোরাণকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তোলাই শুধু উদ্দেশ্য ছিল না আল্লার, আরবি ভাষাভাষী জনগণ ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য এ গ্রন্থ প্রেরিত হয়নি এটাও ছিল তাঁর বক্তব্য। বিশেষ করে যখন আরো দু'টি প্রাসঙ্গিক আয়াতের সঙ্গে এ-আয়াতটিকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। (14:1-27, Yusuf Ali)-তে আছে ঃ "Revelation leads mankind from the depths of darkness into light. It comes to every age and nation in its own language. So was it before; so is it always." অর্থ ঃ "মানবজাতির ওপর আল্লার অহিবাণী নাজেল করা হয় অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফেরানোর উদ্দেশ্যে। এই বাণী প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির কাছে প্রেরিত হয় তার নিজেরই ভাষায়। এই ছিল অতীতের রীতি, এই হবে চিরকালের রীতি।" (14:4 Yusuf Ali)-তে আছে ঃ "We sent not an apostle except (to teach) in the language of his (own) people, in order to make (things) clear to them." অর্থ ঃ "আমরা প্রত্যেক জাতির কাছে দূত পাঠিয়েছি তার নিজের ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্যে যাতে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তাদের কাছে।" এই আয়াতগুলো পড়ে বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থায় বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। তাহলে কি সব ভুল শিখিয়েছে আমাদের মৌলভীসাহেবরা ? "It comes to every age and nation in its own language", কোরাণেরই কথা। কিন্তু একথা যদি কোন মসজিদে গিয়ে বলি বা কোন ধর্মভীরু মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে বসে বলি তাহলে তো তৎক্ষণাৎ আমার গলা কেটে ফেলবে। অর্থাৎ আল্লাতা'লা প্রত্যেক জাতির কাছে বাণী পাঠিয়েছেন প্রত্যেক যুগে তাঁর নিজেরই ভাষাতে, এবং ভবিষ্যতেও পাঠাবেন। প্রত্যেক জাতি ? তাহলে কি বুদ্ধকে তিনিই পাঠিয়েছিলেন ? গুরু নানককে ? কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ ? কনফুসিয়াস ? এঁরা কারা ? এঁরা সবাই কি আল্লারই বার্তাবহ দূত ? এই আয়াতগুলো যেন তাই বলতে চাইছে আমাকে। ভবিষ্যতেও কি আসবেন তাঁরা ? কি সব্বনেশে কথা মুসলমান পরিবারের সন্তান হয়ে ! কি বিপদে পড়ে গেলাম বলুন তো। এক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে যেয়ে আরো কত প্রশ্ন ভীমরুলের মত জেঁকে ধরল আমাকে।

অহির ব্যাপারে আমার বিমূঢ় অবস্থাটা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে (৩ঃ৭ দাউদ)-এ। "It is He who has revealed to you the Book. Some of its verses are precise in meaning – they are the foundation of the Book – and others ambiguous. ... But no one knows its meaning except God." অর্থাৎ "তিনি এই গ্রন্থ নাজেল করেছেন তোমাদের ওপর। এর অনেক পংক্তির অর্থ একেবারে পরিষ্কার – ওগুলোই হল গ্রন্থখানির মূল ভিত্তি – আবার অনেক পংক্তি আছে যা দ্ব্যর্থবোধক। ... সেগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লা ছাড়া কেউ জানে না।" এর সঙ্গে (১৪ঃ৪) আয়াতটি খাপ খায় কি করে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। কি জানি, হয়ত আমারই ভুল।

প্রশ্ন ঃ বাইবেল আর কোরাণ যদি একই আল্লা থেকে এসে থাকে, তাহলে বাইবেলে আল্লার মূর্তিটা এত প্রেমময় ও করুণাময় কেন, আর কোরাণে আল্লাকে সবসময় এত ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়াণ মনে হয় কেন ? (3:4 Dawood)-এ লেখা আছে ঃ "... God is mighty and capable of revenge" (আল্লা মহাপরাক্রান্ত)। তিনি জানেন কি করে প্রতিশোধ নিতে হয়।") সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে (4:56 Dawood)-এর উক্তিটি ঃ "Those that deny Our revelations We will burn in fire. No sooner will their skins be consumed than We shall give them other skins, so that they may truly taste the scourge. Surely God is mighty and wise." (যারা আল্লার বাণী অস্বীকার করে তারা আগুনে পুড়বে। শুধু তাই নয়, অমান্যতার শাস্তি কাকে বলে সেটা যেন ভাল করে বুঝতে পারে সেজন্যে তাদের সদ্যপোড়া চামড়ার ওপর নতুন চামড়া লাগিয়ে দ্বিতীয়বার পোড়ানো হবে। তখনই বুঝবে আল্লার কত শক্তি, কত মাহাত্ম্য।") আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না এই ভীমমূর্তি আল্লার সঙ্গে বাইবেলের চিরক্ষমাশীল চিরপ্রেমশীল ঈশ্বরের মিল কোথায়।

উত্তর ঃ এ-প্রশ্নের উত্তর আমি এখনো পাইনি। খুঁজে বেড়াচ্ছি সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে, একবার যদি 'প্রেম' নামক অমূল্য শব্দটির দেখা পাই কোথাও। শাস্তি দেখেছি, ভয় দেখেছি, ক্রোধ আর প্রতিশোধ দেখেছি, কিন্তু ভালবাসার উল্লেখ দেখিনি। হয়ত আমারই চোখের দোষ।

প্রশ্ন ঃ কোরাণ তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, স্বয়ং আল্লাপাকের কাছ থেকে নাজেল হয়েছে ফেরেশতা মারফত। এতে কোন ভুলত্রুটি, দ্বিরুক্তি, পুনরুক্তি থাকার কথা নয়। একটি উদাহরণ তুলে ধরছি আমি, তার মর্ম কেউ যদি আমাকে বুঝিয়ে দেন তাহলে বাধিত হব। (20:67 Dawood)-এ আছে ঃ "The sorcerers prostrated themselves, crying: 'We believe in the Lord of Aaron and Moses.' " ওদিকে (26;34 Dawood)-এর শেষাংশে লেখা হয়েছে ঃ "The sorcerers prostrated themselves in adoration, saying: 'We now believe in the Lord of the Universe, the Lord of Moses and Aron.' " পুনরুক্তির মত মনে হয় না ? এরকম উদাহরণ আরো আছে। এগুলোর জবাব আমি কারো কাছ থেকে পাইনি।

কোরাণ সম্বন্ধে আরো বহু প্রশ্ন আছে আমার। যে দুটি উত্তর সাধারণত পাই তার কোনটাই আমার গাণিতিক মন গ্রহণ করতে অপারগ। এক ঃ 'আপনি কোরাণ বিশ্বাস করেন না ?' দুই ঃ 'আপনি আউট অফ কনটেক্সট্।' হতে পারে। তাহলে 'ইন কনটেক্সট্' অর্থটা বুঝিয়ে দিন। তাতেও তিনি নারাজ। কারণ প্রশ্ন করামাত্র আমি দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেলাম। 'আউট অফ কনটেক্সট্' মানেই যেন 'আউট অফ লাইন'। সেই চামড়া-পোড়ানো আগুনই বোধ হয় আমার শেষ জবাব।

অটোয়া
১৫ই জুন, ২০০৪
মুক্তিসন ৩৩